সকলের হাতে কাজ ও অমর্ত্য সেন

দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

অমর্ত্য সেন ২৮-২৯ জানুয়ারি দুই কিস্তিতে পঃ বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে একটি সংবাদপত্রে লিখেছেন। এই শিল্পায়নের সাধারণ ধারাটিকে তিনি সমর্থন করেছেন। তবে আনন্দের কথা, তিনি বলেছেন যে তাঁর এই সমর্থন "গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত না থেকে পারে না" এবং " 'আলোচনা করে শাসন' প্রক্রিয়ার আরও অনুশীলন হয়ে থাকলে কেবল যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সমৃদ্ধ ও উন্নত হত তাই নয়, পঃ বাংলার শিল্পায়ন -- বা পুনর্শিল্পায়নের -- সাধারণ নীতির রূপায়ণ আরও ভাল ভাবে হত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও আরও ভালো হত।" তিনি এ'ও বললেন যে তাঁর এই মন্তব্য কেবল অতীত নয়, ভবিষ্যতের জন্যও প্রাসঙ্গিক। রাজ্য সরকারের যেটুকু সমালোচনা তাঁর মন্তব্যে উহ্য রইল সেটুকুর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

"অপরদের জন্য নতুন উদ্যোগ যাই বেশি আয়ের সংস্থান করুক, কৃষি থেকে জমি সরানোর ফলে জমিতে বসবাসকারী কৃষিজীবি মানুষের দারিদ্র্য বাড়বে " এমন সম্ভাবনা, "নির্দিষ্ট কিছু কিছু পেশার মানুষের ধার্য (আয়) নষ্ট হওয়া, ফলতঃ তাঁদের উপবাসের" সম্ভাবনা, এক কথায় "অধিগৃহীত জমির মালিক ও চাষীদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি ও জীবনের মান" নিয়ে দুশ্চিন্তা'ও তাঁর মতে "অমূলক নয়"। তিনি মনে করেন যে "নিশ্চিতভাবেই" এই প্রসঙ্গে "অনেক কিছু আলোচনার আছে"।
অবশ্য সমাধানের ব্যাপারে তাঁর চিন্তা সরকারী অধিগ্রহণের পরিবর্তে বাজারে জমিক্রয়। যে কৃষিজীবি মানুষরা মালিক নন (সিঙ্গুরে দশ হাজার) বাজারে জমিক্রয় কী ভাবে তাঁদের বুনিয়াদী সামর্থ্য রক্ষা করবে তা বুঝতে পারলাম না।
তবু অপসৃত মানুষের জীবন জীবিকা নিয়ে তাঁর চিন্তা স্বাগত।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল "এস ই জেড" নিয়েও তাঁর অবস্থান বিরোধীর না হলেও অন্ততঃ সমালোচকের। " 'এস ই জেড'য়ে সরকারী রাজস্বের পাইকারী ছাড় যদি সাধারণ নীতি হয়ে দাঁড়াতে চায় তবে তাকে অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও আরও (তীক্ষ্ণ) যাচাইয়ের সম্মুখীন হতে হবে"।

মোট কথা মানুষের দুর্দশা ও তার থেকে উদ্ভূত প্রতিবাদকে অবজ্ঞা করে পঃ বাংলা সরকার যে ভাবে "শিল্পায়ন" চালাতে চাচ্ছেন, বড় পুঁজিপতিদের জমি পাইয়ে দেওয়া এবং "এস ই জেড" নিয়ে তাঁদের নির্লজ্জ ওকালতি, এই পদ্ধতিগুলি থেকে অমর্ত্য সেন তাঁর সমর্থনকে বিযুক্ত করেছেন। সরকারের প্রধান শরিক দলের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে এই রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদের অসম্মতি ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাতে এই টুকু পরোক্ষ সমালোচনাও স্বাগত।

কিন্তু অমর্ত্য সেন পঃ বাংলা সরকারের মূল শিল্পায়ন নীতির সমর্থক। অলংকরণ বাদ দিলে তাঁর যুক্তি "দারিদ্র্য দূর করতে গেলে আয় বাড়াতে হবে"। এই "আয়" কিন্তু নব্যসনাতন অর্থনীতির "আয়",
অর্থাৎ সিঙ্গুরের কারখানার "আয়" বলতে (মূলতঃ) টাটাদের মুনাফা, ব্যাঙ্কের সুদ, সরকারের রাজস্ব এবং কর্মচারীদের বেতন। ভারতের মতো অসাম্য পীড়িত সমাজে (জাতিপুঞ্জের ২০০৪ সালের মানব বিকাশ প্রতিবেদন অনুসারে জাতীয় আয়ের ৪২% ভোগ করে জনসংখ্যার সব চেয়ে ধনী ২০%, আর সব চেয়ে দরিদ্র ২০%'য়ের ভাগ্যে জোটে ৯%) এই "আয়" বাড়লেও দারিদ্র্য একই থাকতে পারে, বাড়তেও পারে। অমিত ভাদুড়ি মাথাপিছু ২৩,০০০ টাকা বার্ষিক "আয়ের" একটি সমাজের উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে আছেন ৯৯ জন দাস, প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ১০০ টাকা, আর এক জন মালিক যার বার্ষিক আয় ২২,৯০,১০০ টাকা! এবার যদি দাসদের মোট বেতন না'ও বাড়ে, কিন্তু এক বছরে মালিকের আয় বেড়ে হয় ২৫,২০,১০০ টাকা, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন জিডিপি'র বার্ষিক বৃদ্ধি ১০% বলে লিপিবদ্ধ হবে! সুতরাং অসাম্য পীড়িত সমাজে জিডিপি বা "আয়" বাড়লেই ধরা যাবে যে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই এ রকম নয়।
অমর্ত্য সেন জানেন এই দিক থেকে সমালোচনা হবে। তাই তিনি বলে রেখেছেন, "অনেক সময় বলা হয় যে উৎপন্ন আয়ের অসাম্যের দরুন ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন বৃদ্ধির উচ্চ হার থেকে দেশ হাতে কিছু পাচ্ছে না।" সত্যিই তো। টাটার বিপুল মুনাফা আর মুষ্টিমেয় কর্মচারীর ভাল বেতন দিয়ে সিঙ্গুরের তথা পঃ বাংলার আম মানুষের কী লাভ?

অমর্ত্য সেন এই সমালোচনার উল্লেখ করলেন, জবাব দিলেন না। "আয়"বৃদ্ধির অন্য উপকারের কথা তুললেন। জিডিপি'র বাড়ার ফলে তার চেয়েও বেশি হারে বাড়ছে সরকারী রাজস্ব, যা কি না "সরকারপুষ্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সাধারণের ব্যবহার্য পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবেশ সুরক্ষা ও সাধারণের ভোগ্য অন্যান্য দ্রব্য যোগান দিতে আরও বেশি বেশি বিনিয়োগের আশ্চর্য সুযোগ সৃষ্টি করছে।" কোনও ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলেই বিনিয়োগ হয়? এবং ঠিক ঠিক লক্ষ্যে বিনিয়োগ হয়? নব্য উদারপন্থী "সংস্কার"মনস্ক সরকার দেখবে না বাজার কী চাইছে? বাজার মানে ক্রয়ক্ষমতা। যে ক্রয়ই করে না সে তো বাজারের বাইরে। সরকারের টাকা থাকলে মল হবে, ফ্লাইওভার হবে। কী হবে না দেখা যাক।

২০০২ সালে ১৫-৩৫ বয়সের ৩১% মানুষ নিরক্ষর ছিলেন। এঁরা সকলেই ১০ বছর বয়স পেরিয়েছেন বামফ্রন্ট রাজত্বের ৩০ বছরের ভিতর। বামফ্রন্ট রাজত্বের চতুর্বিংশ বছরে ১২,০৮৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ক্লাস ঘর ছিল, ১২,০৫৪টির একটি ক্লাস ঘর ছিল, ১৩৮৪টি স্কুলের কোনও ক্লাস ঘর ছিল না (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি শ্রেণী থাকে)। পরিমাণ দিয়ে খালি শিক্ষার বিচার অসম্ভব। উৎকর্ষে আসা যাক। নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বাচ্চাদের মধ্যে যারা প্রাইভেটে পড়ে না তাদের ৭% নিজের নাম ঠিক করে লিখতে পারে, যারা প্রাইভেটে পড়ে তাদের মধ্যে এই সংখ্যা ৮০%।

২০০২-০৩ সালে কৃত স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি নমুনা সমীক্ষা ধরা যাক। সমীক্ষার দিন ১৮টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের ৭টি কাজ করছিল না। ৩টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটিতে রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ২৯% রোগী হাতুড়েদের কাছে চিকিৎসা করানোর কথা বলেছেন। বীরভূম জেলায় সম্পূর্ণ টীকাকৃত শিশুর অনুপাত ছিল ৪৫%, কোনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্টানের বাইরে প্রসবের ঘটনার অনুপাত ৫৩%। সমীক্ষার পিছনের মলাটে উদ্ধৃতি ঃ "আমাদের সমীক্ষার সীমিত চিত্রটি থেকেও যেটি উঠে আসে তা হল সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটির সুদূরপ্রসারী পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার দিকটি।... সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং তাদের দেওয়া সেবাগুলির স্বল্পতার একটি ফল হল বেসরকারী চিকিৎসকদের বেড়ে ওঠা। এমন কি অত্যন্ত দরিদ্র মানুষদেরও বেসরকারী চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।...সমস্যার মূলটি কোথায় তা সরকারী স্বাস্থ্যসেবাগুলির স্বল্পতা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অচলাবস্থা, এই দুটি ব্যাধির থেকেই ভাল ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।" এ সব বামফ্রন্ট রাজত্বের ২৫ বছর পর বলতে হল। কে বললেন? অমর্ত্য সেন।
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্ধৃত তথ্য ও সমীক্ষা দুটি তাঁরই সৃষ্ট প্রতীচী ট্রাস্টকৃত।
সাধারণের জন্য পরিবহন? পঃ বাংলা সরকার "রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্যোগ পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম" গ্রহণ করেছেন। 'পুনর্বিন্যাস' মানে রাজ্য সরকার ৭৪% পর্যন্ত মালিকানা বেসরকারী মালিককে হস্তান্তর করতে পারবেন। এই কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'পুনর্বিন্যস্ত' হবে রাজ্য সরকারী পরিবহন সংস্থাগুলি এবং রাজ্য বিদ্যুত পর্ষত!

"দারিদ্র্য দূর করতে গেলে আয় বাড়াতে হবে", সঠিক কথা, যদি বর্ধিত আয়ের পাশাপাশি সেই আয়ের বন্টন দরিদ্রের পক্ষে যায়। দাতব্য মারফৎ নয়, কর্মসংস্থান মারফৎ। জিডিপি'কে যেহেতু কর্মীসংখ্যা আর কর্মী প্রতি উৎপন্নের গুণফল হিসাবে দেখাটা বেজায় ভুল নয় তাই উৎপাদনশীলতা না কমিয়ে কর্মসংস্থান বাড়লেও জিডিপি বাড়বে। বস্তুতঃ বন্টন কর্মীদের পক্ষে রেখে জিডিপি বাড়ানোর এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।
কেন দেশিবিদেশি বেসরকারী বড় পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ ভিত্তিক "শিল্পায়নের" বিরোধিতা করা হচ্ছে? অমর্ত্য সেন ধরে নিয়েছেন কারণটা "কমিউনিস্ট" মতাদর্শ সংক্রান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রীতি। তাই (রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রনির্ভর) কিউবা আর (ব্যক্তিমালিকানার নয়া ভক্ত) চীনের তুলনা করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। আসলে কারণটা কিন্তু বাস্তব সংক্রান্ত। বেসরকারী বড় পুঁজি (বিশেষতঃ বিদেশের বাজারে) প্রতিযোগিতার দৌড়ে ক্রমাগত মজুরি বাবদ খরচ কমাতে চায়, ফলে কর্মসংস্থান নয়, সে চায় কর্মীসংকোচন। ফলে তার বিনিয়োগে জিডিপি বাড়বে বেকারসংখ্যা বাড়িয়ে, বন্টনকে দরিদ্রের বিপক্ষে পাঠিয়ে। বেকারত্ব বাড়বে, দারিদ্র্য কমবে না। তাই দেশিবিদেশি বেসরকারী বড় পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ ভিত্তিক "শিল্পায়নের" বিকল্প খোঁজাটাই জরুরী।

আর চীন ও কিউবার তুলনায় কী দাঁড়াল? চীনে "সংস্কারের" আগে সবার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা ছিল। "সংস্কারের" পরে ২০%য়ের বেশি মানুষের এই সুরক্ষা নেই। পরন্তু কিউবার সাধারণের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা এত ভাল যে কিউবার মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু প্রায় মার্কিন দেশের সমান। সবার জন্য স্কুল

শিক্ষায় কিউবা সফল। এ সবই তো অমর্ত্য সেন নিজেই লিখছেন। তা ছাড়া জাতিপুঞ্জের মানব বিকাশ সূচক (২০০৫) অনুসারে কিউবার স্থান ৫১, সূচকের মূল্য ০.৮৩৮, চীনের স্থান ৮১, সূচকের মূল্য ০.৭৭৭(ভারতের স্থান ১১৮, সূচকের মূল্য ০.৬১৯)। অমর্ত্য সেন আর মাহবুব উল হকের কাজের ফলেই তো আমরা মানব বিকাশ সূচকের গুরুত্ব শিখেছি। মানব বিকাশের মূল্যে চীনের জিডিপি বাড়ানোর পথ থেকে সদর্থক কী শেখার আছে?

নব্য সনাতনী/নব্য উদারপন্থী মৌলবাদী গোঁড়ামি বাদ দিয়ে দেশের বাস্তব অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় যে পুঁজি ডেকে এনে আর যাই হোক বেকার সমস্যা মিটবে না।
প্রতি বছর কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কত বাড়ছে?
১৫-৫৯ বছর বয়সের মানুষকে যদি কর্মক্ষম ধরি তা হলে এই বয়সের পাল্লার মধ্যে বাৎসরিক সংখ্যাবৃদ্ধির হিসাব করতে হবে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পঃ বাংলায় ঐ বছর ৪,৮১,৮৪,০০০ মানুষ ছিলেন ১৫-৫৯ বছর বয়সের পাল্লার মধ্যে। যোজনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ সালে সারা ভারতে এই পাল্লার মধ্যে ৫১.৯ কোটি মানুষ ছিলেন, ২০ বছরে এই সংখ্যা হবে ৮০ কোটি। তা হলে এই চক্রবৃদ্ধি হারেই (২.১৮৭%) যদি ২০০১ থেকে ২০০৭'য়ে পঃ বাংলায় ১৫-৫৯ বছরের পাল্লার মধ্যেকার মানুষের সংখ্যা হিসাব করি তা দাঁড়াবে ৫,৪৮,৬২,৬৪৬। আর ২০০৭'য়ে দাঁড়িয়ে কর্মক্ষম মানুষের বাৎসরিক সংখ্যাবৃদ্ধির আন্দাজ হবে ১১,৯৯,৮৪৬।
তা হলে আন্দাজ ১২ লাখ নতুন কর্মপ্রার্থী নিয়ে প্রতি বছর পঃ বাংলায় চিন্তা করতে হবে।

সিঙ্গুরে টাটার (প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী) ১০ হাজার (কত বছরে কে জানে) আর হলদিয়া পেট্রোকেম কারখানার (বাস্তবায়িত) ৬৭০জন (+ ১২০০ ঠিকা মজুর, হলদিয়ার শিল্প কমপ্লেক্সে ৫ বছরে আন্দাজ মোট ৩২০০জন, আর হলদিয়ার ভাটির প্লাস্টিক শিল্পে ৫ বছরে আন্দাজ ৮-১০ হাজার) দিয়ে কী হবে? বেকার সমস্যার বাস্তব হল ৫ বছরে নতুন ৬০ লাখ কর্মপ্রার্থী।
[৬৭০+১২০০, পঃ বঙ্গ বিধানসভার শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সিলেক্ট কমিটির ২০০৭ সালের প্রতিবেদনের তথ্য; ৩২০০ আর ৮-১০ হাজার, লেখকের হিসাব, দেখুন "হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস ও পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পায়ন(হীনতা)"]

চাই বিকল্প কোনও পথ যাতে কেউ বেকার না থাকে। কাজ চাই। আজ না হোক কাল, অন্ততঃ আগামী বছর। ১০ বছর পরে চাকরি পাবে এই স্তোক যেন শুনতে না হয়। না খেয়ে কেউ ১০ বছর বাঁচে না।
অমিত ভাদুড়ি সকলের জন্য কর্মসংস্থান হবে এমন বিকল্প শিল্পায়নের কথা তুলেছেন (পড়ুন তাঁর 'ডেভেলপমেন্ট উইদ ডিগনিটি'। তাঁর প্রস্তাবের কেন্দ্রে রয়েছে পরিকাঠামো নির্মাণ (রিলিফের কাজ নয়, বাস্তবিক ভাবে প্রয়োজনীয় ও দস্তুর মতো উৎপাদনশীল কাজ) ও (পঞ্চায়েতের মতো) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্থার উদ্যোগে শ্রমনিবিড় শিল্প বিস্তার। বড় পুঁজি নিজের মতো শিল্প গড়ুক। সরকার দৃষ্টি দিক কর্মসংস্থানমুখী বিকল্প গড়ার কাজে।

আমরা চাই রাজ্য সরকার জনমুখী বিকল্প পথে শিল্পায়ন নিয়ে চিন্তা করুন যাতে সকলের হাতে কাজ আসে। দুঃখের কথা, তার বদলে অমর্ত্য সেন তাঁদের উৎসাহিত করলেন কর্মহীন বৃহৎ বিনিয়োগের দেউলিয়া পথে চলতে।